# এক্সেসিভ রিলিজিয়াস জিল্ এ্যান্ড কন্সার্ভেটিজম মে লিড টু এক্সট্রিমিজম
## (Excessive Religious Zeal and Conservatism May Lead to Extremism)

এস.এম. আমার খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। টেলিফোনে প্রায় কথা হয়। এস.এম.ই ফোন করে। আমার অনেকগুলো দোষের মধ্যে একটা হলো কাউকে ফোন না করা। একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার মত উন্নত একটা দেশে বাস করেও আমি সেল্ফোন ব্যবহার করিনা। টুকটাক দরকারি ফোন-টোন যা করা লাগে, তা বাসার ল্যান্ড ফোন থেকেই সেরে ফেলা যায়। "ও তো এখন বাসায় নেই, কোনো মেসেজ দিতে হবে?" কিম্বা "ড্যাড্ বাসায় নেই, মসজিদে গেছেন; আসলে কিছু বলতে হবে?"- এ জাতীয় রিজোনিং বা এক্সকিউজগুলো কেবল ল্যান্ড ফোনের সুবাদেই আমাকে অসংখ্য খেজুরে আলাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সেল্ফোন সাথে থাকলে এসব এক্সকিউজের সুযোগ থাকতোনা নিশ্চয়। অবশ্য আমার ফোন না করার ঘাটতি আমার স্ত্রী অনেকাংশে পুষিয়ে দেন। তার সেল্ফোন ছাড়াও বাসার ল্যান্ড ফোনে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কি সব আন্লিমিটেড সিস্টেম আছে যার মাধ্যমে আমেরিকা, কানাডাসহ বাংলাদেশে এবং সাথে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াতেও নাকি ঘন্টার পর ঘন্টা ফোন করা যায়। মজার ব্যাপার হলো, টেলিফোনে প্রায় নিয়মিতই আমার পরিবারের সদস্যদেরসহ আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলেন আমার স্ত্রী, যা আমাকে 'অসামাজিক' খেতাব পাওয়া থেকে ক্রমাগত রক্ষা করে চলেছে।

এস.এম.-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন তার ও আমার বাড়তি ঘনিষ্টতার আরেকটা কারন। বুয়েটের একসময়ের প্রগতিশীল একটা রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির একজন ছাত্রনেতা, বিতার্কিক, তুখোড় প্রেমিক এবং ফটকাবাজ এস.এম.-এর ধর্মচর্চাহীন জীবন-যাপন থেকে সাম্প্রতিককালের ধর্মীয় জীবন-যাপনে উত্তরণ রীতিমত লক্ষ্যনীয় এবং অনেকের জন্যে শিক্ষনীয়ও। ধর্ম আমাদের বন্ধুত্বের সাম্প্রতিক গাঢ়ত্বে অন্যতম প্রভাবক। কেননা আমরা দুজনই মোটামুটি ধার্মিক। সমস্যা শুধু একটাই। ধর্মের ব্যাপারে আমার মডারেট এ্যাটিচিউড এস.এম.-এর একেবারেই পছন্দ নয়। তাতে অবশ্য আমাদের বন্ধুত্বে তেমন অসুবিধে হয়না; কেননা একতরফা বিতর্কে আমি বেশীরভাগ সময়ই নিরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করি। তাছাড়া টেলিফোনে তর্ক-বিতর্কের বাড়তি সুবিধা হলো প্রতিপক্ষের চেহারা দেখা যায়না। আমি নিশ্চিত, আমাকে ননস্টপ উপদেশবলী দেয়ার সময় আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে এস.এম. হয়ত চেপে যেতো।

যেমন, মওলানা আবুল কালাম আজাদের ব্যাপারটা, যিনি এনটিভি'র 'আপনার জিজ্ঞাসা' নামক ইসলামিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। আমি বললাম, "লোকটাকে আমার পছন্দ নয়; কথাবার্তায় সবসময় কেমন যেন একটা এ্যারোগ্যান্ট-এ্যারোগ্যান্ট ভাব। তাছাড়া আমি কবে যেন একটা আর্টিকেলে পড়েছি লোকটা নাকি একাত্তরে রাজাকার ছিল; তৎকালীন 'বাচ্চু' নামধারী এই লোকটা ফরিদপুরে মানুষ হত্যা, রেইপ্ করা থেকে শুরু করে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা সেসময় করেনি"। ব্যস, এস.এম. আমাকে চেপে ধরলো, "ভদ্রলোক একাত্তরে নাকি একান্নতে কি করেছিল সেটা নিয়ে এখনও পড়ে থাকবি? তোরা কবে ওসব ছাইপাশ ইতিহাস ভুলে সামনের দিকে তাকাতে শিখবি? ভদ্রলোকের নলেজ দেখেছিস ইসলামে? তাছাড়া এমন সুন্দর সুন্দর যুক্তি দিয়ে সব কথা বলেন! যেন একেবারে মনের কথা। বাংলাদেশের ইসলামী সমাজে ওনার এখনকার কন্ট্রিবিউশনটাই বড় কথা। ওসব ইতিহাস খোঁচাখুঁচির দরকার কি? কে কবে কি করেছিল সেটা বড় কথা নয়, এখন কি করছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট। তোদের এই এক দোষ, নিজেরা ইসলামের জন্যে ভাল কিছু করবিনা; আর ওনার মত পটেনশিয়াল কেউ তা করতে গেলে অমনি ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করবি। উনি আজ আমাদের দেশের অন্যতম একজন রিলিজিয়াস ফিগার। ওনার সম্পর্কে আন্দাজে এসব উল্টাপাল্টা বলা ঠিক না"। আমি মিনমিন করে বলতে গেলাম, "ঠিক আছে, লোকটা তোর-আমার মত রহিমউদ্দিন, করিমুদ্দিন হলে সমস্যা ছিলনা; কিন্তু উনি দেশের এতবড় একটা রিলিজিয়াস ফিগার বলেই না ওনার পেছনের ইতিহাস জানাটা গুরুত্বপূর্ণ!" উত্তরে ধমকে উঠলো এস.এম., আমাকে পাত্তাই দিলো না।

এবছর একুশে ফেব্রুয়ারী পড়লো রোববারে। মেট্রো ফিনিক্স-এর চ্যান্ড্লার শহরের একটা চার্চে একুশের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো স্থানীয় বিভিন্ন বাংলাদেশী সংগঠন। সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান। প্রভাতফেরী এগারটায়। আমি ছেলেমেয়েদের

নিয়ে সকাল সকালই পৌঁছে গেলাম। বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি ছেলেমেয়েকে আমাদের ভাষা, আমাদের দেশের কৃষ্টি এবং এসবের ইতিহাসের সাথে আরো একবার পরিচয় করিয়ে দেয়াটাও যাওয়ার আরেকটা উদ্দেশ্য। গতবছরও গেছি। প্রভাতফেরীর পর যখন গান-বাজনা শুরু হয়, তখন সাধারনত চলে আসি আমরা। এবারই শুধু ব্যতিক্রম। 'শিকড়' বাংলা স্কুলের ষ্টলে আমার প্রথম প্রকাশিত বই 'রঙ দিয়ে যায় চেনা' বিক্রি হচ্ছিল। কাজেই আমাকে প্রায় সারাদিনই থাকতে হলো অনুষ্ঠানে। পরের রোববারে এস.এম.-এর ফোন পেলাম- "কিরে, গত রোববার সারাদিন কোথায় ছিলি?" একুশের অনুষ্ঠানে ছিলাম শুনেই ফোড়ন কাটলো এস.এম.- "ও, তুইতো আবার 'ম-দা-রে-ত' মুসলমান, যাকে আরেক ভাবে বলা যায় 'মদ' খাওয়া মুসলমান। দিস্ ইজ প্লেইন্‌লি স্টুপিড। কাঠ-খড় আর কাপড় দিয়ে তিনটে খাম্বা বানিয়ে সেখানে ফুল দেয়ার যে কি মানে, তা আমার মাথায় আসেনা। দিনশেষে যেটা ভেঙ্গেই ফেলবি, সেটা বানানোরই বা দরকার কি? আর সেখানে ফুল দেয়ারই বা মানেটা কি? এ সবই আসলে হিন্দুয়ানী কালচার; পুজা দোস্ত, পুজা; দিস্ ইজ প্লেইন্‌লি পুজা। মূর্তি বানিয়ে পুজা করা আর মনুমেন্ট বানিয়ে ফুল দেয়া আসলে একই জিনিষ। আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানিস? তোদের এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে যদি এক লাথিতে ওসব শহীদ মিনার-ফিনার ভেঙ্গে ফেলতে পারতাম, তাহলে হয়ত আরেকটু বেশী শান্তি পেতাম মনে"। আমি মিনমিন করে খানিকটা প্রতিবাদ করতে গেলাম পুজার ব্যাপারটা নিয়ে; এস.এম. এক ধমকে আমাকে থামিয়ে দিলো, পাত্তাই পেতে দিলোনা।

কি জানি, হয়ত এস.এম.-এর কথাই ঠিক। শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হয়ত ধর্মীয়ভাবে ঠিকনা। আফ্‌টার অল, গান-বাজনা শুরু হওয়ার আগেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি যে বাসায় চলে আসি, তার কারনটাও তো ধর্মীয়ই। কোনো ওলামাকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি ধর্মীয়ভাবে ব্যাপারটা কতখানি ঠিক নাকি ঠিকনা। তবে বুদ্ধিগত দিক দিয়ে বিষয়টাকে দেখলে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটাকে অনেকখানিই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি যে একুশের দিন শহীদ মিনারে যাই তাতেও যেমন আহামরি কোনো লাভ নেই, আবার এস.এম. যে শহীদ মিনারে যায়না তাতেও আহামরি কোনো ক্ষতি নেই। ব্যাপারটা রিলেটিভ এবং তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের সাথে এর সম্পর্ক হওয়া উচিত বলে আমার ধারনা। সে অর্থে এস.এম.-এর সাথে এ বিষয়ে আমার কোনো মৌলিক দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তবে সমস্যা হলো শহীদ মিনার বিষয়ে সামগ্রিক মনোভাবটা নিয়ে।

এস.এম. চরমপন্থী মনোভাবের ঠিক একধাপ পেছনে রয়েছে। এই ধাপটা ক্রস্ করলেই শহীদ মিনারে বোমা ফাঁটানো, প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহনকারীদেরকে শারিরিকভাবে আক্রমন করা, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সহজেই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক মনে হয়। লাথি দিয়ে শহীদ মিনার ভাঙ্গার বাসনা হওয়ার পরের ধাপটাই কিন্তু সর্বশেষ ধাপ, যা ভায়োলেন্ট। ধর্মচর্চাহীন জীবন-যাপন থেকে ধর্মীয় জীবন-যাপনে উত্তরণে এস.এম. একটা প্রসেস-এর ভেতর দিয়ে গেছে যেখানে ধর্ম নিয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করার পাশাপাশি আমাদের উপমহাদেশসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য মুসলিম স্কলারদের বক্তৃতা সে শুনেছে (বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে এবং ইন্টারনেটে)। এটা একটা প্রচলিত প্রসেস যার মাধ্যমে আধূনিক শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে ধর্মচর্চাহীন জীবন-যাপন ছেড়ে ধর্মীয় জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। এবং তত্ত্বগতভাবে এতে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু থাকার কথা নয়। কেননা, আমার নিজের ধর্মীয় জীবন-যাপনে পদার্পনও এই প্রসেসের মাধ্যমেই। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই প্রসেসটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটো ডিস্টিংক্ট (distinct) পথের যে কোনো একটাতে মানুষটাকে টেনে নিয়ে যায়। একটা পথ হলো, নিরীহ ধর্মপালনের একাগ্রতা বা উৎসাহ জাগা যা ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও সাধারনত ভায়োলেন্ট মনোভাবের দিকে যায়না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পথটা শুরুতে নিরীহ ধর্মপালনের একাগ্রতা বা উৎসাহ জাগার মাধ্যমে শুরু হলেও ক্রমে তা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও চরমপন্থার দিকে টার্ন নেয় যা মানুষটার মাঝে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য বিদ্বেষের জন্ম দেয়। আর দুঃখজনক হলো, এই রোগ কেবল এস.এম.-এর একার মধ্যে নয়, বাংলাদেশী এবং নন-বাংলাদেশী- এদেশে বসবাসকারী অনেক মুসলমানের মধ্যেই আমি এহেন এক্সট্রিম মনোভাবের প্রাদূর্ভাব লক্ষ্য করেছি। সমস্যাটা সেখানেই। কেননা এই মনোভাবেরই পর্যায়ক্রমিক ও প্রক্রিয়াগত এ্যাড্‌ভান্স্‌ড্ রূপ হলো আজকের ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ সমর্থন।

এবার তাসের অন্য পিঠটা দেখি। কবে যেন কার কাছে একটা প্রবাদ শুনেছিলাম, "অন্যের পকেটের পয়সাতেই যখন খাবো, তখন ডাল-ভাত কেন? পোলাও-কোর্মাই খাই"। ক্রিশ্চিয়ান রেডিক্যালিজমে অধুনা কনভার্ট হওয়ার অসংখ্য উদাহরন যদিও খুঁজে পাওয়া

যাবে আধুনিক সভ্যতার দেশ খোদ আমেরিকাতেও, তবে ছোট-খাট এসব উদাহরন না খুঁজে আমেরিকার একসময়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর মানুষটার কথাই ধরিনা কেন? যারা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, জর্জ ডব্লিউ বুশ-এর রাজনৈতিক উত্থানের ওপর নির্মিত হলিউডের 'W' মুভিটা দেখেছেন, তাদের হয়ত মনে আছে, টেক্সাসের গভর্ণর নির্বাচিত হওয়ার প্রায় বছর আষ্টেক আগে বুশ কিভাবে 'বিলি গ্র্যাম' (Billy Graham) নামের একজন রেডিক্যাল প্রোটেস্ট্যান্ট প্রীষ্ট-এর (Protestant Priest) হাতে বায়াত হয়ে ধর্মীয় নবজীবন লাভ করেন (became a born-again Christian) এবং আমার বন্ধু, এস.এম.-এর মতই ধর্মচর্চাহীন জীবন-যাপন ছেড়ে ধর্মীয় জীবন-যাপন শুরু করেন। মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ, যিনি নিজে একজন মডারেট এপিস্‌কোপাল প্রোটেস্ট্যান্ট (Episcopal Protestant) ছিলেন এবং সেসময় সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করছিলেন, এভানজেলিক্যাল (Evangelical) খ্রীষ্টানদের ভোটব্যাংক-কে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিলি গ্র্যামের সাথে তার পরিবারের ঘনিষ্টতার সূত্রপাত করেন। দুঃখের বিষয়, বিলি গ্র্যাম একসময়ের মডারেট মেথোডিষ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট (Methodist Protestant) জুনিয়র বুশকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন তার ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে রেডিক্যালিজমে কনভার্ট হতে যা পিতা সিনিয়র বুশ কল্পনাও করেননি এবং যা তাকে যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন করেছিল জুনিয়র বুশের ভবিষ্যত ভাবনায় যা মুভিটাতে দেখানো হয়েছে। অবশ্য মতান্তরে শোনা যায়, বুশ নাকি তারও প্রায় বছর খানেক আগেই রেডিক্যালাইজ্‌ড্‌ হন 'আর্থার ব্লেসিট' (Arthur Blessitt) নামের আরেক রেডিক্যাল প্রীষ্ট-এর বক্তৃতা শুনে কিম্বা মতান্তরে তার সংস্পর্শে এসে। মজার ব্যাপার হলো, বিলি গ্র্যাম বা আর্থার ব্লেসিটকে তালেবান নেতা মোল্লা ওমর কিম্বা ইয়েমেনে নির্বাসিত মুসলিম রেডিক্যাল ধর্মনেতা আনোয়ার আওলাকী'র খ্রীষ্টান ভার্শন বললে মনে হয়না খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে।

ডব্লিউ বুশের 'রিলিজিয়াস ফেইথ'-এর ওপর লিখিত অসংখ্য আর্টিকলে পাওয়া যায়, বুশ বিশ্বাস করতেন রেডিক্যাল মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যেই ঈশ্বর তাকে পছন্দ করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং তার আফগানস্থান ও ইরাক আক্রমন প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন। 'নাইন-ইলেভেন'-এর পর বুশের মুখ দিয়ে প্রথম যে শব্দটা বের হয়েছিল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তা হলো, 'ক্রুসেড' অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বুশের মুখঃনিসৃত এ অসম্ভব কথাটা বিশ্ববাসীকে অবাক করলেও ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝা যাবে, বুশ আসলে লিবিয়ার রাষ্ট্রনেতা গাদ্দাফী কিম্বা ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদ-এর খ্রীষ্টান ভার্শন বৈ আর কিছু নয়। বুশ তার হোয়াইট হাউসের ওয়েষ্ট উইং-এ নিয়মিত রোমান ক্যাথলিক রেডিক্যাল পাদরীদের নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রুদ্ধদ্বার মিটিং করতেন যেখানে তার প্রশাসনের কারো প্রবেশাধিকার ছিলনা। এমনকি চরম কন্‌সার্‌ভেটিভ হিসেবে পরিচিত তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রাম্‌স্‌ফেল্ড, কিম্বা তার রাজনৈতিক গুরু, কার্ল রোভ-এরও নয়। শোনা যায়, ডমেষ্টিক নীতি নির্ধারন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়ে পলিসি মেকিং-এ বুশ এসব রেডিক্যাল পাদরীদের পরামর্শ নিতেন। ইরাক আক্রমনের আগে বুশ তার ওয়েষ্ট উইং-এর অফিসে এসব পাদরীদের ডেকে নিয়ে তাদের দিয়ে ইরাক যুদ্ধকে হালাল করিয়ে নিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই, যেভাবে আফগানস্থানের তোরাবোরা পাহাড়ের গুহায় নেতৃস্থানীয় ওলামাদের ডেকে নিয়ে তাদের দিয়ে 'বিন লাদেন' আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলা চালানো তথা 'নাইন-ইলেভেন'-এর হামলাকে হালাল করিয়ে নিয়েছিল বলে শোনা যায়। ভাবতে অবাক লাগে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এক্সেসিভ রিলিজিয়াস জিল্‌এবং আল্ট্রা কন্‌সার্‌ভেটিভ মানসিকতা কিভাবে সবাইকে একই কাতারে টেনে এনে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়! 'নাইন-ইলেভেন'-এর সন্ত্রাসী হামলাকে হালাল বলে ফতোয়া দানকারী মুসলিম মোল্লাদের সাথে ইরাক আক্রমনকে হালাল বলে ফতোয়া দানকারী খ্রীষ্টান মোল্লাদের কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে? নাকি সে অর্থে মৌলিক পার্থক্য আছে বিন লাদেনের সাথে বুশের? সাদা জোব্বা, সাদা পাগড়ী পরে কালো পাহাড়ের গুহায় বসে নিরীহ মানুষ হত্যার নীলনক্সা করা যেভাবে সন্ত্রাস এবং নক্সাকারী যেভাবে সন্ত্রাসী, কালো স্যুট-বুট পরে 'সাদা হাউসে' বসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরীহ মানুষ হত্যার নীলনক্সা করা একইভাবে সন্ত্রাস এবং নক্সাকারী একইভাবে সন্ত্রাসী। দুঃখের বিষয়, দু'জনই সমানভাবে মানবতার শত্রু হলেও বিশ্ববাসীর চোখে কেবল একজন অসভ্য এবং বাকিজন সভ্য হিসেবে বিবেচিত।

এ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির (ASU) 'মেমোরিয়াল ইউনিয়ন' ভবনে প্রতি রোববার বিকেলে একদল বাংলাদেশী বাচ্চাকে নিয়ে বসে 'শিকড়' বাংলা স্কুল। আমার ছেলেমেয়েরা 'শিকড়'-এর নিয়মিত স্টুডেন্ট। সপ্তাহ তিনেক আগের কথা। 'মেমোরিয়াল ইউনিয়ন'

ভবনের দোতলায় ২৩৮ নম্বর রুমে 'শিকড়'-এর ক্লাস হচ্ছে। শফিকের বড় ছেলেটাও 'শিকড়'-এ যায়। শফিক বুয়েটের। আমার এক বছরের জুনিয়র। বাচ্চাদের নামিয়ে দিয়ে শফিক আর আমি সাধারনত এ.এস.ইউ. ক্যাম্পাসের পাহাড়টাতে হাঁটতে যাই বৈকালিক ব্যায়ামটা এই সুযোগে সেরে নেয়ার জন্যে। সেদিন কেন জানি শফিক আসেনি। 'মেমোরিয়াল ইউনিয়ন' ভবনের দোতলায় সপ্তাহের অন্যান্য দিন ইউনিভার্সিটির রেগুলার ক্লাস হয়। লম্বা করিডোরের জায়গায় জায়গায় সোফা ফেলানো রয়েছে বসার জন্যে। মাত্র দু'ঘন্টার ব্যাপার। চোখ বন্ধ করে কোনো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করেই দু'ঘন্টা পার করে দিতে পারবো ভেবে তেমনই একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়লাম। যে সোফাটায় আমি বসেছি, তার বিপরীত দিকেই একটা ক্লাস রুম। রুমের দরজাটা বন্ধ। তবে কাঠের দরজার খানিকটাতে গ্লাস লাগানো রয়েছে, যা দিয়ে রুমের ভেতরটা অনেকাংশেই দেখা যায়। দেখলাম প্রায় ১০/১২ জন যুবক ভেতরে রয়েছে যাদের প্রত্যেকের বয়স ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে। চেহারা দেখেই বুঝা যায় আমাদের সাব-কন্টিনেন্টের। প্রত্যেকের গায়ে কালো গেঞ্জি। তবে পরনে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুলপ্যান্ট। প্রত্যেকের কপালে লাল ফিতা বাঁধা। রুমের সাদা টিউব লাইটগুলো নেভানো। তবে রুমের চারকোনায় চারটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালানো রয়েছে যেগুলোর উজ্জ্বল হলুদাভ আলোতে রুমের সবকিছুই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছেলেগুলোর প্রত্যেকে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে এবং একইসাথে কোমর সোজা রেখে 'নীল-ডাউন' (kneel down) ভঙ্গীতে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের সবচেয়ে যে সামনে রয়েছে, তারও সামনে একটা চেয়ারের গায়ে লম্বা একটা লাঠিতে লাল-কালো রঙা একটা পতাকা জড়ানো রয়েছে এবং পতাকার দু'পাশে মাটিতে কতগুলো মোমবাতি জ্বলছে। প্রত্যেকেই 'নমষ্কার' ভঙ্গীতে দুইহাত একসাথে করে চোখ বুজে রয়েছে। ছেলেগুলোর সবার মুখ রুমের সামনের দিকের পতাকার দিকে ফেরানো কেবল একজন ছাড়া। এই ছেলেটা পতাকার অপর পাশে বাকি ছেলেগুলোর দিকে মুখ করে একইরকম 'নীল-ডাউন' ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কি কি যেন বলছে এবং বাকিরাও প্রত্যুত্তরে কি কি যেন বলছে। আমি কৌতুহলী চোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে থাকলাম। একটু পরই তাদের 'রিচুয়াল' শেষ হলো। মোমবাতি নেভানো হলো; টেবিল ল্যাম্পগুলোও নেভানো হলো এবং প্রায় একইসাথে রুমের সাদা টিউব লাইটগুলো জ্বলে উঠলো। মাথা থেকে লাল ফিতা খুলে ফেলে ছেলেগুলো রুমের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। সবচেয়ে আগে বেরুনো ছেলে দু'টো শ্যেন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি অপার্থিব একটা অনুভূতি আমার মেরুদন্ড বেয়ে শির শির করে নীচে নেমে গেল। আমি অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নিলাম। তবে চোখ সরানোর আগে ওদের গায়ের কালো গেঞ্জিতে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা 'Hindu Yuva' শব্দটা আমার নজর এড়ালোনা।

ব্যাপারটা তত্ত্বগতভাবে আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক কিছু মনে হওয়া কিন্তু উচিত নয়। কেননা, মসজিদে আমাদের মুসলমানদের নামাজ পড়ার সাথে এদের 'রিচুয়াল' পালনের খানিকটা মিল আছে, যেমনটা ইমাম সাহেব করেন এবং বাকি মুসল্লীরা তাকে অনুকরন করেন। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অন্যরকম। আমি যদি কোনো হিন্দু টেম্পলে যেতাম এবং সেখানে একদল হিন্দু নারী-পুরুষকে অনুরূপ 'রিচুয়াল' পালন করার একটা দৃশ্য দেখতাম, তাহলে আমার কাছে সেটা সামান্যও অস্বাভাবিক লাগতো না। বরং ভালই লাগতো। কেননা, আমি বরাবর অন্যান্য ধর্মের 'রিচুয়াল'-এর ব্যাপার-স্যাপারগুলো জানতে আগ্রহ বোধ করি এবং তা করি শ্রদ্ধার সাথেই। কিন্তু ২০/২৫ বছর বয়সী ১০/১২ জন ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যুবক ভিন্ন দেশে পড়তে এসে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে যখন এমন কট্টরভাবে কোনো 'রিচুয়াল' পালন করে, তখন কেন জানি খানিকটা খটকাই লাগে।

হঠাৎ করেই আমার তখন বুয়েটের কথা মনে পড়ে যায়। বুয়েটের ক্লাস শুরুর তখন এক সপ্তাহও হয়নি। আমি থাকতাম আহসানউল্লাহ হলের নীচতলার একটা রুমে, যেটা 'রাজনৈতিক রুম' হিসেবে সেসময় বিখ্যাত ছিল। ছাত্র ইউনিয়নের আহসানউল্লাহ হল শাখার সভাপতি এবং ছাত্রলীগের আহসানউল্লাহ হল শাখার সহ-সভাপতি আমার দুই রুমমেট ছিলেন। আমিই ছিলাম ঐ রুমের একমাত্র অরাজনৈতিক ব্যক্তি। কামরুল ভাই আমার দেশী, মানে ঝিনাইদহের এবং উনি তখন ছাত্র শিবিরের বুয়েট শাখার সভাপতি কিম্বা সাধারন সম্পাদক ছিলেন। উনি থাকতেন আহসানউল্লাহ হলেরই চার তলায়। এক বিকেলে কামরুল ভাই ওনার রুমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। ক্যাডেট কলেজে পড়ার কারনে রাজনীতিতে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলনা। কাজেই কামরুল ভাইয়ের সাথে স্বভাবতই আমার বৈরীতার কোনো কারন ছিলনা। ওনার রুমে পৌঁছে দেখি মিটিং হচ্ছে ওনাদের। আমাকে সবার সাথে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন কামরুল ভাই। মুখে কেউ কিছু না বললেও বুঝলাম ওনারা সবাই শিবিরের। হাদিসের একটা বই থেকে ওনারা গোটা কয়েক হাদিস পড়লেন। এরপর পুরো সপ্তাহে কে কি কি আমল করেছেন বা করতে পারেননি, সে বিষয়ে হিসেব-নিকেশ নেয়া-

দেয়া করলেন। এবং সবশেষে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কার কি অগ্রগতি এবং কে কি ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করলেন ওনারা। আমি যদিও সেসময় ধর্ম-কর্মের একদম ধার ধারী না, কিন্তু ধর্ম পালন না করার কারনে এক ধরনের অপরাধবোধ মনে মনে খানিকটা ছিলই। সে হিসেবে কামরুল ভাইদের মিটিংটাকে আমার কাছে বরং ভাল লাগারই কথা ছিল। কিন্তু ওনাদের কথাবার্তায় এমন কিছু ছিল, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক এ্যারোগ্যান্স এবং সুপিরিয়রিটির এমন একটা টোন্ (tone) ছিল, যা আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছিল পটেনশিয়াল 'রেড ফ্ল্যাগ' (red flag) এবং এরপর থেকে শিবিরকে আমি আর কোনোদিন পছন্দ করিনি। 'Hindu Yuva'র ছেলেগুলোকে দেখে প্রথম নজরেই কেন জানি ছাত্র শিবিরের কথা মনে হয়েছিল আমার। এটাকেই বোধহয় বলে মানুষের 'সিক্সথ্ সেন্স', কেননা 'Hindu Yuva' সম্পর্কে আমি তখনও পর্যন্ত কিছুই জানিনা।

ঐ দিন বাসায় ফিরে রাতে গুগল সার্চ দিয়ে যা পেলাম তাতে মনটা খারাপই হলো। উইকিপিডিয়াতে 'হিন্দু ইউভা বাহিনী' সম্পর্কে নীচের ডেফিনিশন্টা পেলামঃ

The **Hindu Yuva Vahini** (HYV) is a Hindu youth group, founded by Yogi Adityanath, the leader of the Gorakhpur Mutt temple in Gorakhpur, India. The group has a high penetration among the largely unemployed youth of eastern Uttar Pradesh, where the collapse of the sugar industry and the closing down of a Fertilizer Corporation of India plant has led to increased unemployment in recent years.

By organizing various movements such as 'Ram Prakostha' for pavement dwellers and the 'Bansfod Hindu Manch' for woodcutters, Adityanath has provided a sense of identity for many of these frustrated youth, who have swelled the ranks of the Hindu Yuva Vahini. The HYV has many Dalit members in addition to traditional caste Hindus, and the group is united by opposition to Islamic Fundamentalists who have a history of dominating the region and engaging in the persecution of Hindus, especially low-caste Dalits who were rarely accorded protection from Islamic persecution by the caste Hindus because of traditional casteist prejudices.

The Hindu Yuva Vahini has been implicated by Islamist sympathizers in the Mau riots of October 2005, where they organized the Hindu forces in opposition to the militant Islamist politician Mukhtar Ansari, the alleged murderer of Bharatiya Janata Party (BJP) state legislature member Krishnanand Rai. Charges of inciting riots, murder, and arson were brought against Hindu Yuva Vahini leaders Ajit Singh Chandel and Sujit Kumar Singh, along Ansari and some others in the opposite camp. Eventually, a curfew was imposed on Mau for nearly a month.

The same groups accuse HYV of involvement in the Gorakhpur riots of January 26-31, 2007. After the arrest of Yogi Adityanath, the HYV launched retaliations. Two coaches of the Mumbai bound Mumbai-Gorakhpur Godan Express were set ablaze on January 30, 2007.

Note: the abbreviation of 'Hindu YUVA' is Hindu Youth for Unity, Virtues and Action.

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং এর পাশাপাশি অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও বেকারত্ব কিভাবে ধর্মীয় রাজনীতির ছাঁয়াতলে একদল বঞ্চিত মানুষকে এক্সট্রিম একটা আইডিয়োলজির পেছনে সুসংহত করে, তা একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে না বুঝার কোনো কারন নেই। উত্তর প্রদেশের গোরাখপুরে যোগী আদিত্যনাথ কর্তৃক হিন্দু ইউভা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীতে এই বাহিনীর উত্থান অনেকটা আফগানস্থানে তালেবানদের উত্থানের মত যেখানে এক্সট্রিমিজিম মূলত অশিক্ষা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ধর্মীয় রাজনীতির বাই-প্রডাক্ট। গোরাখপুরের স্থানীয় কোনো কলেজে হিন্দু ইউভা বাহিনীর একদল যুবককে সংঘবদ্ধভাবে এমন 'রিচুয়াল' পালন করতে দেখলে আমি হয়ত সামান্যও অবাক হতাম না। কিন্তু আমেরিকার মত সুসভ্য, প্রগতিশীল একটা দেশে বসে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া একদল ছেলে ভার্সিটির ক্যাম্পাসে 'Hindu Yuva' মনোগ্রাম খঁচিত গেঞ্জি গায়ে এক্সট্রিম একটা আইডিয়োলজী অন্তরে লালন করছে এবং তার চর্চা করছে দেখে মনটা খারাপই হলো আমার। ইন্টারনেটে আরেকটু ঘেঁটেঘুঁটে দেখলাম, হিন্দু ইউভা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, যোগী আদিত্যনাথ ভারতের হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক দল, বিজেপি'র একজন সাংসদ এবং একইসাথে একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। ভারতের সংসদে দেয়া এক ভাষনে তিনি একবার বলেছিলেন, "মহাত্মা গান্ধীর বদলে জাতির জনকের

সম্মান ভগবান রাম অথবা কৃষ্ণকে দেয়া উচিত"। চারদলীয় জোট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী, জামাতে ইসলামী'র নিজামী কিম্বা মুজাহিদ-এর সাথে যোগী আদিত্যনাথ-এর কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে? নাকি সে অর্থে খুব বেশী মৌলিক পার্থক্য আছে শীর্ষস্থানীয় পাকিস্থানী তালেবান নেতা, ক্বারী হুসেইনের ধর্মশিষ্য, সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটির টাইম্‌স্ স্কয়ারে গাড়ীভর্তি এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরণ ঘটানোর নিস্ফল পরিকল্পনাকারী, পেশাজীবী MBA, ফয়সাল শাহজাদের এক্সট্রিম আইডিয়োলজির সাথে ASU-এর গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস্, হিন্দু ইউভা বাহিনীর সদস্য এই ছেলেগুলোর এক্সট্রিম আইডিয়োলজির?

এতক্ষণে হিন্দু ইউভা বাহিনীর ছেলে দু'টোর আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকানোর 'শানে নজুল' পরিষ্কার হলো। আমার গোঁফহীন লম্বা দাঁড়ি এবং গায়ে হাঁটু অব্দি লম্বা ফতোয়া দেখে যে কেউই বুঝে যাবে আমি একজন কট্টর মুসলমান এবং অমুসলিম কারো এধারনা হওয়াও নেহায়েত অমূলক নয় যে, আমি হয়ত 'বিন লাদেন' কিম্বা 'মোল্লা ওমর'-এর দূঃসম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই। মনে মনে ভাবলাম, "আচ্ছা! আজ আমি ধূতি পরা, গলায় পৈতে ঝুলানো একজন নিরীহ ধর্ম পালনকারী ভালমানুষ হলেও কি ঠিক একই চোখে আমার দিকে তাকাতো না এদেশের ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া একজন 'মুসলিম উম্মাহ' তথা প্রবাসী ছাত্রশিবির কর্মী? তাহলে হিন্দু ইউভা বাহিনীর ছেলেগুলোরই বা দোষ কতটুকু?"

আব্দুর রহমান আবিদ
রচনাকালঃ মে, ২০১০